ভে তরে

এই সংখ্যা ছয় পাতার

'কন্যাশ্রী'... নামেই চমক, বাস্তবে শূন্যগর্ভ ... ২

... মোদীর উন্নয়ন মিথ ও মিথ্যাচার ৩

আইন আদালত ও একটি সরকার ... ৪

পাঠকের চিঠি ও লেখকের বক্তব্য ... ৫

আজকের দেশব্রতী

₹ ১.৫০

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ১৩ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২৪ এপ্রিল ২০১৪

পেছনে ভূত সিঙ্গুর-সারদার পোড়া মুখে ঔদ্ধত্য মোদী-মমতার

নরেন্দ্র মোদী। আজকের কর্পোরেট ইণ্ডিয়ার 'ক্রোনি ক্যাপিটাল' থেকে শুরু করে মিডিয়ার সবচেয়ে পেয়ারের দোস্ত—'নমোজী'। আরও একবার তিনি নির্বাচনী প্রচারে বাংলা ঘুরে গেলেন। আর উসকে দিয়ে গেলেন সিঙ্গুর নিয়ে তাঁর বিকল্প কর্পোরেট বিনিয়োগের ভাবনায়। বলে গেলেন কেন্দ্রে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে, আর এরাজ্যে যারা ক্ষমতায় তারা চাইলে, সিঙ্গুরে শিল্পায়নের ভাবনায় তিনি অবশ্যই কিছু ভাববেন-করবেন। তিনি এই প্রত্যাশাও খোলাখুলি রাখলেন, নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠনের প্রশ্নে তৃণমূলী সহযোগিতার দরজা যেন খোলা থাকে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বিজেপি প্রচার ও প্রচারকদের এক বিশেষ বিভাজন করে নিয়েছে। বিজেপি চাইছে এখানে ভোটের বাক্সে ভাগ বাড়াতে প্রধানতম শক্তি তৃণমূলের বিরুদ্ধে জমে ওঠা মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে পুঁজি করতে। আর, নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর কেন্দ্রে সরকার গঠনের প্রশ্নে যাতে পস্তাতে নয় তার জন্য জন্য তৃণমূলের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে। প্রথমোক্ত কাজটা চালানোর হাতিয়ার বলাইবাহুল্য বিজেপি রাজ্য শাখা। আর বার্তা দেওয়ার প্রচারটা জিইয়ে রাখতে আসা যাওয়া করছেন 'নমোজী'। তিনি পয়লাবার দলের ব্রিগেড সভায় এসে 'জোড়া লাড্ডু'র লোভ দেখিয়েছিলেন। এখানে রয়েছে তৃণমূল সরকার। কেন্দ্রে আনা হোক বিজেপি সরকার। তাহলে দুহাতে 'লাড্ডু' মিলবে। দুই সরকার মিলেমিশে 'উন্নয়ন' করা যাবে। 'উন্নয়ন' হবে কর্পোরেট পুঁজির লাইনে, গুজরাট মডেলে, যে উন্নয়নে কর্পোরেটশ্রেণী ও তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় সরকারের ইচ্ছাই থাকবে প্রথম এবং শেষ কথা। এই সারসত্য মোদী চেপে রাখেননি, বরং খুব প্রকটভাবে জোরের সাথে প্রকাশ করেছেন। ব্রিগেডের সভায় উপরন্তু বিজেপি সভাপতি রাজনাথ টোপ দিয়েছিলেন কেন্দ্রের কাছে মমতা সরকারের 'মোরাটোরিয়াম' চাওয়ার দাবি সমর্থনযোগ্য। তৃণমূল কিন্তু বিজেপির মোকাবিলায় ঐসব প্রশ্নে মুখ ছোটানোয় নেই। মমতা ব্যানার্জীর দল কেবল বলছে দাঙ্গার মুখদের ভোট না দিতে। এটা বলছে কারণ প্রথমত, বিজেপি এরাজ্যে মাথা তুলতে চাইছে। দ্বিতীয়ত, নরম হিন্দু ভোট ও সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক তৈরী করতে, ধরে রাখতে। ধর্ম থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে চলার প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান তৃণমূলের অভিধানে নেই। বরং মঠ-মন্দিরের হিন্দু পুরোহিত থেকে শুরু করে মোল্লা-ইমামদের মাধ্যমে ভোট ভিক্ষা করাও তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশলের অঙ্গ। আর, তাদের সংখ্যালঘু সংরক্ষণের পলিসি-প্রকল্প যত না কাজের, তার চেয়ে অনেক বেশী কাগুজে এবং ভোটব্যাঙ্ক তৈরীর উদ্দেশ্যে। এই সুবিধাবাদী অবস্থান থেকে মোদীর মোকাবিলার দৌড় আর কতটুকু। ঐ ভোট সর্বস্ব।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের চেহারাটা, মোদীর সাম্প্রদায়িক গণহত্যাকারী কসাই চরিত্রটা যতখানি বহুল পরিচিত, কর্পোরেট দালালীর চেহারাটা এখনও দেশজুড়ে তত উদ্ঘাটিত হয়নি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে দুরকম পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শক্তি। একদিকে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী পুনরুত্থানের মেরুকরণ ঘটাতে মোদীর গুজরাট পরীক্ষিত অভিযানকে চালান করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশে, কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে মুজফফরনগরে। এরপরেও মোদী সম্প্রদায় গোয়েবেলসীয় প্রচার চালাচ্ছে—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকেও নাকি গুজরাট 'উন্নয়নযজ্ঞে' সামিল করানো হয়েছে! গেরুয়া শক্তির অন্য পরিকল্পনা হল, কর্পোরেটপন্থী 'উন্নয়ন মুখ'কে সামনে নিয়ে আসা, যাতে একে আজকের সময়োপযোগী প্রশ্নাতীত দাবি করা যায়, যাতে এ দিয়ে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী অপরাধকে আড়াল দেওয়া যায়।

মোদী প্রবণতাকে কার্যকরি মোকাবিলার সদিচ্ছা ও কার্যকরি ক্ষমতা কোনটাই মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর দলের নেই। মোদীর সিঙ্গুর, কর্পোরেট নির্দেশিত উন্নয়ন পলিসি ও কেন্দ্রের সরকার গঠন সংক্রান্ত প্রশ্নে উস্কানোর প্যাকেজের কোন পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিদির দলের নেই।

পাঁচের পাতায় দেখুন

হুগলী লোকসভা কেন্দ্রে সংগ্রামী প্রার্থী সজল অধিকারী

শাসক পার্টির প্রার্থীদের হুডখোলা জিপ থেকে হাত নাড়া, সারি সারি গাড়ি নিয়ে ঝাঁ চকচকে রোড শো, রাজপথে ধোঁয়া-ধুলোর ঝড় তোলা এই চাকচিক্যময় প্রচারের বাইরে হুগলী লোকসভা কেন্দ্রের সি পি আই (এম এল) প্রার্থী সজল অধিকারী জেলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মেঠো পথ, শ্রমিক বস্তি, গঞ্জ এলাকায় মাইলের পর মাইল হেঁটে জনগণের সঙ্গে এক আন্তরিক সৌজন্য বিনিময়, রাজনৈতিক মত বিনিময় ও প্রচার করে চলেছেন।

গত ১২ এপ্রিল পাণ্ডুয়া বিধানসভার বৈঁচী গঞ্জ এলাকায় পথ পরিক্রমা চলে। প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন পাণ্ডুয়া ব্লক কমিটির সম্পাদক শুভাশিষ চ্যাটার্জী, নিরঞ্জন বাগ, বৈঁচীর কাসেম, সরস্বতী, পাভেলের মতো স্থানীয় সংগঠক এবং বৈঁচীর জনপ্রিয় পার্টি নেতা মুকুল কুমার।

দুপুরের দু-এক ঘন্টার সাময়িক বিরতির পর বিকেলে পাণ্ডুয়া থানার সামনে থেকে শুরু হয় আড়াইশো জনের এক দৃপ্ত মিছিল। আমাদের রাজ্য সম্পাদক, জেলা সম্পাদক, সমগ্র ব্লক কমিটির উপস্থিতিতে লালঝাণ্ডা নিয়ে দীর্ঘক্ষণের মিছিল পাণ্ডুয়ার বাম প্রভাবিত জনগণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। পাণ্ডুয়া এলাকায় ব্লক স্তরের কর্মসূচীর পাশাপাশি স্থানীয় স্তরেও চলছে জোরালো প্রচারাভিযান। ১০ এপ্রিল সকালে ইলছোবা-মণ্ডলাই অঞ্চলে প্রার্থী সজল অধিকারীকে নিয়ে রাজ্য কমিটির সদস্য দেবব্রত ভক্ত, বিনয় বাউলদাস, পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ সিরাজউদ্দিনের নেতৃত্বে ১০০ জনের মিছিল অঞ্চলের ঝিটকেপোঁতা, আঁচগড়, মুকটিকুড়ি গ্রামগুলোতে কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও সাইকেলে ঘোরেন।

বিকেলেই আবার বেরিয়ে পড়া লাগোয়া বলাগড় বিধানসভা অঞ্চলে। এবার পুরোটাই পায়ে হেঁটে ঘোরা। মালঞ্চ, ইটাগড়, মহিপালপুর, ভালকির ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের সঙ্গে প্রার্থী পরিচিতি ও প্রচার চলে। এই বিধানসভা এলাকায় ১৭ তারিখ দুবেলা প্রার্থীকে নিয়ে প্রচার হয়। সজল অধিকারী গুপ্তিপাড়ার বড়বাজার থেকে স্টেশন বাজার হয়ে স্টেশন সংলগ্ন গোডাউন পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দেন, বহু মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন। বিকেলে ৪টে থেকে ৭টা পর্যন্ত দীর্ঘ তিন ঘন্টার যাত্রাপথ ছিল বাকুলিয়া, ধোবাপাড়া, ইছাপুর-বেলেডাঙ্গা, ইলমপুর, কুলেপাড়ার গ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে। ইনচুরা বাজারে এক সংক্ষিপ্ত সভার মধ্যে দিয়ে এই কর্মসূচী শেষ হয়।

সি পি আই (এম এল) প্রার্থী সজল অধিকারী ধনেখালির ভূমিপুত্র। এলাকার গরিব কৃষক ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের আন্তরিক যোগাযোগ। ছাত্র জীবন থেকে বাম রাজনীতি শুরু করা সজলের কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি ধনেখালি রেল স্টেশন গড়ে তোলার আন্দোলন সহ বিভিন্ন গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে। বিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন তৃণমূলের সন্ত্রাসে কোনও প্রচারই চালাচ্ছে না তখন ১৪ এবং ১৫ এপ্রিল ধনেখালি ও পোলবা-দাদপুর ব্লকে পরপর ২ দিন প্রচার চলে। প্রথমদিন শতাধিক মানুষ সজল অধিকারীকে নিয়ে শিবাইচণ্ডী, গোস্বামী-মালপাড়া, হারিট, পোলবার দীর্ঘ অঞ্চল পরিক্রমা করেন। ৬টি গাড়ি নিয়ে মিছিল শুরু হয় তালচিনান থেকে যেখানে বর্ষার সময় গরিব এলাকাগুলোতে প্লাবনের

দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্য নদী ও খাল সংস্কারের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়েছে সি পি আই (এম এল)। এই প্রচার কাজে সামিল হয়েছিলেন এলাকার বয়স্ক কমরেডরা, সামিল হয়েছিলেন রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, রাজ্য কমিটি সদস্য দেবব্রত ভক্ত। পরের দিন প্রচার চলে ধনেখালি, মল্লিকপুর, মান্দ্রা, দাদপুর, গৌরীপুর, দশঘড়া, বেলমুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে। দুটি কর্মসূচীতেই মহিলারা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এই এলাকাতেই ১১ এপ্রিল সেনেটে সফল কর্মীসভা এবং ১৭ এপ্রিল হারিট বাজারে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটি সদস্য জয়তু দেশমুখ ও অপূর্ব ঘোষ।

জেলার নির্বাচনী টিমের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮ ও ১৯ এপ্রিল প্রার্থীকে নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রচার চলে শিল্পাঞ্চল শহর কেন্দ্রীক চন্দননগর ও চুঁচুড়া বিধানসভায়। ভদ্রেশ্বর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক কমরেডরা চন্দননগর বিধানসভায় প্রচার চালান। প্রচারপত্র বিলি আর হিন্দি ও বাংলায় আমাদের দাবি সম্বলিত শ্লোগান

ছয়ের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

এভাবে অবাধ নির্বাচন সম্ভব!

লোকসভা নির্বাচন এখন মধ্য পর্বে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা উঠছে তেতে। গ্রীষ্মের দাবদাহের থেকেও বেশী উত্তপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিমণ্ডল। নির্বাচন কমিশনও সক্রিয়তার প্রশ্নে সাজ সাজ রব তুলতে এবং নিত্যনতুন অন্তত কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়ে সাড়া ফেলতে পিছিয়ে থাকছে না। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে কমিশন অন্তত দু-বার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের কর্তৃস্থানীয়দের সরিয়ে দেওয়ার বদ্‌লি করার। এতে কমিশন শাসকদলের রোষের মুখেও পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সর্বময় কর্ত্রী নির্বাচন কমিশনের গৃহীত প্রথম পদক্ষেপটির সময় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। প্রথমে বলেছিলেন—'কমিশনের নির্দেশ মানব না'। পরে পশ্চাদপসরণ করেছেন বার্তাটি ব্যুমেরাং হচ্ছে দেখে। যদিও মুখে বলেছেন, নির্বাচন চুকে গেলে ঐ অফিসারদের পূর্ববৎ স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। যদিও তা বড় গলায় বলার নয়। কেননা, নির্বাচন উপলক্ষে যে কোন বদ্‌লির আদেশ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়; ভারপ্রাপ্তরা পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে আসাই প্রথা। দ্বিতীয়বার নির্বাচন কমিশন যখন আবার কিছু বদ্‌লির সুপারিশ করে তখন ফের খোদ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী প্রচার মঞ্চ থেকে কমিশনের উদ্দেশ্যে তোপ দাগতে এই সমস্ত বদ্‌লির আদেশকে এই বলে উপহাস করলেন 'ওরা সব আমাদের লোক'। পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেস নিজস্ব প্রচার-কর্মসূচীর ক্ষেত্রে কমিশনের বিভিন্ন শর্তাবলী পেশীশক্তির জোরে অমান্য করে চলেছে। বিরোধী কর্মীকে অপবাদ দিয়ে প্রকাশ্যে পিটিয়ে মারা, অনুমতির পরোয়া না করে বাইক মিছিল, সভামঞ্চ থেকে ভয় দেখানো (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—১৬ মে-র পর দেখে নেওয়া হবে)! এইসব হামলা-হুমকি চলতেই থাকছে। এভাবে আজ পশ্চিমবাংলার শাসকদল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিষিয়ে তুলছে। কোনও বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করছে না। তাই, নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যে কিছু বিধিব্যবস্থা নিলেও পরিস্থিতির বিপজ্জনকতার তুলনায় তা যৎসামান্য।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাকী রাজ্যে রাজ্যের দিকে তাকালেও একই পরিদৃশ্য প্রতীয়মান। যেমন, মুজফফরনগরে ঘাঁটি গেড়ে ভোট রাজনীতির সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী মেরুকরণের অপরাধে এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে কারণে সেখানে বিজেপির গুজরাট থেকে পাঠানো মোদীর খুনে ডান হাত অমিত শাহ্‌-র নির্বাচনী কার্যকলাপের অধিকার নির্বাচন কমিশন কেড়ে নিয়েছিল। অমিত শাহের উপর কায়েম হয়েছিল কমিশনের বিধিনিষেধ। কিন্তু কদিনেরই বা জন্য! দুদিন না যেতে অমিত 'ভুল স্বীকার করে' আবার ফ্যাসিবাদী অমিত বিক্রম প্রদর্শনের স্বমহিমায়। তাছাড়া নির্বাচন কমিশন শাহ্‌কে বিরত করছে তো কি, গিরিরাজ-তোগারিয়ারা উন্মত্ত হচ্ছে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারের ঘোষিত সংখ্যালঘুবিরোধী এ্যাজেণ্ডাগুলোর প্রতিফলন দেখাতে। বিশেষত গিরিরাজ জিগির তুলেছেন, মোদী-বিজেপির বিরুদ্ধতা করা মানেই আসলে পাকিস্তানপন্থার ওকালতি করা! তোগারিয়ার দাবি হল, হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে সংখ্যালঘু মুসলিমরা থাকতে পারবে না, জোত-জমি কিনতে পারবে না। এভাবে দেশের সংখ্যালঘু জনতার দেশপ্রেমের বোধ ও বসবাস করার অধিকারকে জোরজবরদস্তি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের মতাদর্শ-রাজনীতি-ক্ষমতার প্রতি বশ্যতা স্বীকারের পূর্বশর্তের সাথে। তাই প্রশ্ন থাকছে, এহেন বিষাক্ত নির্দিষ্ট প্রকাশগুলোকে ধরে নির্বাচন কমিশন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? এভাবে কি অবাধ নির্বাচন সম্ভব?

সি পি আই (এম এল)-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস

২২ এপ্রিল সি পি আই (এম এল)-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও কমরেড লেনিনের ১৪৫তম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতায় পার্টির রাজ্য অফিসের সামনে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন পার্টির কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের বর্ষীয়ান সদস্য অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অভিজিৎ মজুমদার, রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব বসু, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী, রাজ্য কমিটি সদস্য জয়তু দেশমুখ, কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য দিবাকর ভট্টাচার্য, নবকুমার বিশ্বাস, তরুণ সরকার, অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী; দেশব্রতী পত্রিকার তরফে অরূপ পাল, বাবলু দাস প্রমুখ। মাল্যদান পর্বের শেষে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচী শেষ হয়। তারপরে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে সামিল হয়ে কমরেডরা লেনিনের ১৪৫তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়াও ২২ এপ্রিল সি পি আই (এম এল)-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে যাদবপুর পালবাজার, ঢাকুরিয়ায় শহীদনগর পার্টি অফিসে, বেহালার সিরিটি কালিতলা পার্টি অফিসে ও মুচিপাড়া অঞ্চলে, টালিগঞ্জে বাঁশদ্রোণীতে ও ভবানীপুরে পার্টির প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। পার্টির পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান ইত্যাদি পর্বের মধ্য দিয়ে পার্টি কর্মীরা এই দিবসটিকে উৎসাহের সঙ্গে পালন করেন। অন্য জেলায়ও পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচনে পার্টির প্রার্থী দেওয়া জেলাগুলোতে পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করা হয় প্রচার কর্মসূচী, সভা ও পরিক্রমাকে কেন্দ্র করে। কুচবিহারের জেলা পার্টি কার্যালয়ে সকালে পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য রাজু গোস্বামী এবং প্রজাপতি ও অন্যান্য কমরেডরা। বিকালে ভেটাগুড়ি পার্টি অফিসে এক মিছিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে সকালে পার্টির রক্তপতাকা উত্তোলন করেন বর্ষীয়ান জেলা সদস্য বিজন সরকার। এছাড়া আলোচনাসভা করা হয়। বক্তব্য রাখেন প্রদীপ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী সহ জেলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ময়নাগুড়ি ২ নং লোকাল কমিটির সম্পাদক ভাস্কর দত্তের পরিচালনায় সাপটিবাড়ি অঞ্চলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়নাগুড়ি ১ নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে হেলাপাকড়ি অঞ্চলের পার্টি অফিসে পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদক শ্যামল ভৌমিক। পরে আলোচনাসভা করা হয়। দার্জিলিং জেলা কার্যালয়ে সকালে পতাকা উত্তোলনের পরে বিকেলে পার্টি গঠনের ইতিহাস ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য গৌরী দে, জেলা কমিটি সদস্য কল্লোল চক্রবর্তী, অপু চতুর্বেদী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটি সদস্য পবিত্র সিংহ, জেলা কমিটি সদস্য শরৎ সিংহ সহ পার্টি সদস্যরা। সভা পরিচালনা করেন জেলা কমিটি সদস্য মোজাম্মেল হক।

'কন্যাশ্রী' 'যুবশ্রী' ঃ নামেই চমক, বাস্তবে শূন্যগর্ভ

বছরে ৫০০ টাকা, অর্থাৎ মাসে ৪২ টাকা। এই পয়সায় প্রতিদিন দু-মুঠো মুড়ি বা দু-একটা লজেন্স শিশুদের মিলবে কিনা সন্দেহ! অষ্টম শ্রেণী থেকে এই 'ভাতা'(!) পাওয়ার পর ১৭ বছর পর্যন্ত স্কুলে পড়াশুনা করলে বিবাহের আগে কন্যা পাবে এককালীন ২৫ হাজার টাকা। এই প্রকল্পের গালভরা নাম হল কন্যাশ্রী। ঢাকঢোল পিটিয়ে, ব্যানার হোর্ডিং লাগিয়ে, বিজ্ঞাপনে চতুর্দিকে ছয়লাপ করে প্রচার চলছে এই প্রকল্প নাকি 'স্কুল ছুট' আর 'বাল্যবিবাহ' রোধ করতে কার্যকরি ভূমিকা নেবে। কিন্তু গরিব ক্ষেতমজুর, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী পরিবারগুলো এককালীন ২৫ হাজার টাকা পাওয়ার সুযোগ আদৌ পাবে কি? বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ১৭ বছর পর্যন্ত স্কুলে যায় এমন ছাত্রীদের মধ্যে গরিব শ্রমজীবীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। গ্রামীণ জেলাগুলোর স্কুলে দেখা যায়—অষ্টম শ্রেণীর পর মেহনতী ঘরের মেয়েদের ৮০ শতাংশই স্কুলের পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ঐ শ্রেণীর মানুষের বোধবুদ্ধিতে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর মধ্যে আশু ফলপ্রসূ কোন লাভ নেই। গ্রামের গরিব পাড়াগুলোতে দেখা যায়, সকাল থেকে সন্ধ্যে উদয়াস্ত মজুরি শ্রমের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে পরিবারের নাবালক ছেলেরাও যোগ দেয়। ফলে 'দিনমানে' ভিটেমাটি আগলে থাকা অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হাতে স্কুলপড়ুয়া নাবালিকা মেয়েদের নিরাপত্তা কিভাবে সুনিশ্চিত থাকে? এই আশঙ্কা-অনিশ্চয়তা থেকে বাল্যবিবাহের প্রথা আজও বহাল তবিয়তে টিকে আছে। বর্তমান আর্থিক সংকটের দিনে তা বেড়েছে বৈ কমেনি। তার চেয়ে বরং মেয়ে তুমি ইটভাটা কিংবা রাস্তার কাজ, পাথরভাঙ্গা বা চাষে দিনমজুরির কাজে যোগ দাও। দুটো বাড়তি পয়সার সংস্থান হবে যে! এটাই গরিবের আর্থিক সামাজিক বাস্তবতা। আজ যখন মূল্যবৃদ্ধি আর প্রকৃত আয় কমে যাওয়া—এই দ্বিমুখী সাঁড়াশি চাপ গরিবের গলায় ফাঁস হয়ে চেপে বসেছে, তখন 'লেখাপড়া করে যে, বিয়ের সময় ২৫ হাজার পাবে সে' এই সরকারি সুবচন তাদের কাছে নির্মম রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিমধ্যে 'কন্যাশ্রী'-র জন্য যত আবেদন জমা পড়েছে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে তাতে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বিপরীতে প্রকল্পের মানদণ্ড অনুযায়ী বাৎসরিক পারিবারিক আয়ের যে সীমা নির্ধারণ করা আছে—১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, শাসক দলের নেতাদের যোগসাজশে আয়ের শংসাপত্র যোগাড় করে ধনী বা স্বচ্ছল শ্রেণীগুলো ঐ প্রকল্পের সিংহভাগ সুফল আত্মসাৎ করবে তা বলাই বাহুল্য।

মা-মাটি মানুষের নামে একদিকে বাস্তব চাহিদা, অন্যদিকে অবাস্তব চমক—এই দুইয়ের সত্য-মিথ্যা মিশেল ঘটিয়ে তৃণমূল সরকার একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প হাজির করছে। যেগুলোর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। অন্যান্য দশটা সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের মতো এগুলো আদৌ গরিব মানুষের জীবনধারণের উপযোগী নয়। ঘোষিত উচ্চ লক্ষ্যমাত্রার বদলে এতে উপকৃত হয় খুবই সীমিত সংখ্যক। গরিবের নামে ঐ সীমিত সুফলগুলো ধনীরাই ভোগ করছে। এসবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে থাকে দলবাজী দুর্নীতি, সরকারি দাক্ষিণ্য বিলি করে মানুষকে দলের অনুগত করে রাখার অপকৌশল। যেমন, কন্যাশ্রী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা। সরকারি ঘোষণা হল ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে খরচ হবে ১৫০০ কোটি টাকা। এ জন্য কেন্দ্রের কাছে ৮০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্র আদৌ দেবে কিনা বা রাজ্য কিভাবে এর সংস্থান করবে তার ঠিক নেই। অর্থ সংস্থান না করেই বিগত বছরের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পের সূচনা করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় আবেদনের স্তূপ জমা হচ্ছে, কে পাবে কে পাবে না—বিভ্রান্তি চরমে। আবেদন করা নিয়েও ধোঁয়াসা তৈরী করা হয়েছে, ফর্ম কোথায় পাওয়া যাবে কেউই জানে না। স্থানীয় তৃণমূলী মাতব্বররাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা অসহায়।

সরকারি তথ্য বলছে বাৎসরিক ৫০০ টাকা ভাতার জন্য ১০ লক্ষ ৩০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে, অনুমোদিত ৭ লক্ষ। এই সুবিধা কোটার ভিত্তিতে তপশীলি জাতি-উপজাতি ছাত্রীরা বরাবরই পেতো—এখন এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী বলছেন জেলা পিছু লক্ষ্যমাত্রা ১০ হাজার। এতে জেলা থেকে ব্লক, ব্লক থেকে এলাকা—দেখা যাচ্ছে স্কুল পিছু কোটা গড়ে ২০/২৫টির বেশী নয়, অথচ দাবিদার গড়পড়তা ১৫০/২০০ জন। অন্যদিকে ২৫ হাজার টাকার এককালীন অনুদানের আবেদন জমা পড়েছে ৬২ হাজার ৫৬৫টি, পেয়েছে ২ হাজার ৭০৫ অর্থাৎ ৪ শতাংশ মাত্র।

যুবশ্রী অর্থাৎ বেকারভাতা যা অধুনা গঠিত এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত বেকারদের ছয়মাসের জন্য মাসিক ১৫০০ টাকা দেওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ঐ ব্যাঙ্কে নথিভুক্তদের সংখ্যা ১৭ লক্ষ। দেওয়া হবে ১ লক্ষ জনকে। কারা পাবে বা কারা পাবে না, তারা কবে পাবে—অপেক্ষামান তালিকায় থাকবে কিনা—এসব নিয়ে ধোঁয়াসা রেখে দেওয়া হয়েছে। সাবেক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নথিভুক্ত লক্ষ লক্ষ কর্মপ্রার্থীরা বঞ্চিত থাকবে কেন—তার সদুত্তর নেই।

যতই জাঁকজমকপূর্ণ প্রচার চলুক না কেন এইসব প্রকল্পগুলো ধারাবাহিকভাবে চলবে কিনা তা চরম অনিশ্চিত। **- জয়তু দেশমুখ**

পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর-সাতগাছিয়া জোনাল সম্মেলন

ষোড়শতম সাধারণ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে যখন জাতীয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুঠ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার লুঠ এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষ ছড়ানোর নীতির প্রবর্তক ও সমস্ত রং-বেরঙের শাসক পার্টিগুলো প্রচার চালিয়ে সমগ্র দেশের মানুষকে সমাবেশিত করতে চাইছে, ঠিক তখনই শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকারের দাবিকে জোরালো করতে গত ২০ এপ্রিল রবিবার পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর-সাতগাছিয়া জোনাল কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে গঙ্গারাম কোল সভাগৃহ ও আলাউদ্দিন মঞ্চে। প্রথমে শহীদ স্মরণে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন নির্মাণ ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কিশোর সরকার, শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের বিষ্ণুপুর-সাতগাছিয়া লোকাল কমিটি সম্পাদক দিলীপ পাল ও সদস্য দাউদ আলি মণ্ডল, মহিলা সমিতির পক্ষে রমিশা বিবি, নির্মাণ ইউনিয়নের জোনাল কমিটির সদস্যরা। নীরবতা পালনের পর মূল অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। উদ্বোধনী ভাষণ দেন জোনাল কমিটির নেতা নিখিলেশ পাল ও পরবর্তীতে দিলীপ পাল। এরপর খসড়া প্রতিবেদনের ওপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। প্রকল্প রূপায়ণে সরকারের উদাসীনতা,

চারের পাতায় দেখুন

তথ্য পরিসংখ্যানের আলোয় মোদীর উন্নয়ন মিথ ও মিথ্যাচার

গুজরাট মডেলের উন্নয়ন গাথায় বাস্তব নেই, আছে শুধু কুহক

বিভিন্ন মিডিয়া জুড়ে গত কয়েকমাস ধরে লাগাতার একটা মিথ তৈরি করা হচ্ছে গুজরাট ও তার মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে। বিজেপির পক্ষ থেকে যখন মোদীকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিষিক্ত করা হলো, তখন থেকে এক প্রচার একটা ঝড়ের চেহারা নিল। উন্নয়ন কাকে বলব, তার মডেল কি হবে, শুধু আর্থিক বিকাশকেই উন্নয়ন ধরতে হবে না মানব উন্নয়নের বিবিধ সূচকগুলো তাতে গুরুত্ব পাবে, এই নিয়ে অর্থনীতির দর্শন সংক্রান্ত কিছু ঝোড়ো বিতর্কও আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, যাতে অংশগ্রহণ করলেন এমনকী এই সময়ের দুই দিকপাল অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, জগদীশ ভগবতীও। গুজরাট অন্তত ভারতীয় মানদণ্ডে প্রায় সব পেয়েছির দেশ, সবচেয়ে এগিয়ে থাকা এক রাজ্য (যার নেপথ্যে মোদীর অনবদ্য নেতৃত্ব—যে কথাটা কখনো সোচ্চারে এবং কখনো মৌনমুখরভাবে সামনে আনা হচ্ছে), এই প্রচারের মধ্য কতটা সত্য আর কতটাই বা মিথ্যা তা তথ্যপ্রমাণ সহযোগে যাচাই করা দরকার আছে। নরেন্দ্র মোদী শুধু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দাঙ্গার মুখ হিসেবেই যে কলঙ্কিত তা নন, গোয়েবলসীয় প্রচারের (গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের জমানায় তার প্রচার সচিব। একটি মিথ্যাকে বারবার প্রচার করে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করানোর ক্ষেত্রে তার গৃহীত কৌশল এখন বহু ব্যবহৃত) একটা ধরণেরও যে নিদর্শন গুজরাটের উন্নয়ন সম্পর্কে সযত্নে লালিত মিথ ও সত্যের তুলনা করলেই তা ধরা পড়বে। আমরা স্থান পরিমিতির কথা মাথায় রেখে কয়েকটি মূল প্রসঙ্গকেই এই লেখায় তুলে আনার চেষ্টা করবো।

(১) প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ—মনে রাখা দরকার প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নকে কমিউনিস্টরা কখনোই উন্নয়নের মডেল বলে মনে করে না। এই বিতর্কে এখানে না ঢুকে শুধু এটুকুই মনে রাখার—এই প্রসঙ্গে মোদীর মিথ্যাচারের দিকটি। মোদী ২০১৩-তে তার শিল্পপতি সম্মেলন ভাইব্রান্ট গুজরাটে বলেছিলেন, 'ভারতে বিশ্ব পুঁজির দুয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে গুজরাট'। দাবিটি মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারিতও হয়েছে আর স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো পেইড নিউজ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক দানা বেধেছে। কারণ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ নিয়ে প্রকৃত তথ্যটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্বয়ং জানিয়েছে। সেই তথ্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের নিরীখে মহারাষ্ট্রের (দাদরা, নগর হাভেলি, দমন দিউ সহ) শতাংশমাত্রা ৩২, (উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানার কিছু অংশ সহ) দিল্লীর শতাংশমাত্রা ১৯, সেখানে গুজরাটের শতাংশমাত্রা অন্ধ্রপ্রদেশের সমানই—৪। এর আগে রয়েছে ৬ শতাংশ মাত্রা নিয়ে তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক।

(২) সার্বিক পুঁজি নিবেশ—সার্বিক পুঁজি নিবেশের দিক থেকেও গুজরাট রয়েছে পাঁচ নম্বরে, সমগ্র পুঁজি নিবেশের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে তার শতাংশ মাত্রা ৪.৬। তার আগে রয়েছে ১৮.৩ শতাংশ মাত্রা নিয়ে মহারাষ্ট্র, ১২.২ শতাংশ মাত্রা নিয়ে দিল্লী, ৬ শতাংশ মাত্রা নিয়ে তামিলনাড়ু এবং ৫.২ শতাংশ মাত্রা পশ্চিমবঙ্গ।

(৩) রাজ্যভিত্তিক জিডিপি—১৮ জুন ২০১৩-তে আই বি এন চ্যানেলে এক লাইভ সাক্ষাৎকারে মোদী দাবি করেছেন ভারতের জিডিপি-তে সবথেকে বেশি অবদান রেখেছে গুজরাট। এটিও এক সর্বৈব মিথ্যা দাবি। দেশের সামগ্রিক জিডিপি-তে মহারাষ্ট্রের অংশভাগ যেখানে ১৫ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশের ৮.২ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশের ৭.৮ শতাংশ, তামিলনাড়ুর ৭.৭ শতাংশ, গুজরাটের সেখানে ৭.৩ শতাংশ।

(৪) মাথাপিছু ঋণ—পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সরকারের যাবতীয় সঙ্কটের জন্য বামফ্রন্টের করে যাওয়া বিপুল ঋণের কথা বারেবারে বলে থাকেন। কিন্তু মাথাপিছু ঋণের হিসেবে গুজরাট সবাইকেই পেছনে ফেলেছে। মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু ঋণ ২৫,০০০ টাকা, অন্ধ্রপ্রদেশের ২০,০০০ টাকা, উত্তরপ্রদেশের ১৪,০০০ টাকা। সবাইকে ছাপিয়ে ৩০,০০০ টাকা মাথাপিছু ঋণ নিয়ে সবার শীর্ষে গুজরাট।

(৫) বিদ্যুতায়ন ও বিদ্যুতের মাশুল—গুজরাটের বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত এবং তা অন্যান্য রাজ্যকে বিদ্যুৎ ধার দেয়, এই দাবির পাশাপাশিই যদি মোদী জমানায় বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীকে রাখি, তবে তা খুব আলোকোজ্জ্বল ছবি তুলে ধরে না। মোদী মসনদে বসার আগেই গুজরাটে ৮০.৪ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল আলোকায়নের প্রাথমিক উৎস। ২০০১ থেকে ২০১১ এই দশ বছরে তা আর দশ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০.৪ শতাংশে। কিন্তু এই সময়ে কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক এই হারকে অনেকটা বেশি বাড়িয়ে গুজরাটের ওপরে স্থান পেয়েছে। কেরালা এই দশ বছরে ৭০.২ শতাংশ থেকে ৯৪.৪ শতাংশে, তামিলনাড়ু ৭৮.২ শতাংশ থেকে ৯৩.৪ শতাংশে, অন্ধ্রপ্রদেশ ৬৭.২ শতাংশ থেকে ৯২.২ শতাংশে, কর্ণাটক ৭৮.৫ শতাংশ থেকে ৯০.৬ শতাংশে নিয়ে যেতে পেরেছে। এই হারের নিরীখে গুজরাট দাঁড়িয়ে আছে ১১ নম্বরে।

বিদ্যুৎ মাশুলও ভারতের মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যের তুলনায় গুজরাটে বেশ বেশি। (সারণী-১ থেকেই তা স্পষ্ট হবে)।

(৬) জনস্বাস্থ্য/শিশুমৃত্যুর হার—বিভিন্ন সামাজিক ও কল্যাণমূলক অর্থনীতির নিরীখ থেকে গুজরাট অনেকটাই পিছিয়ে আছে। যেমন শিশুমৃত্যুর হার। আমরা মোদীর সময়কালে গুজরাটের শিশুমৃত্যুর হারের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে এই হারের তুলনা করতে পারি (সারণী-২ দেখুন)। গোটা ভারতে যে সময়পর্বে শিশুমৃত্যুর হার ২৫ শতাংশ কমছে, সেখানে গুজরাটে সেটা মাত্র কুড়ি শতাংশ কমে এখনও ৫৩ শতাংশে থাকছে, যা জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে এক মারাত্মক ইঙ্গিত। পাশাপাশি গুজরাটে ৩৮.৮ শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভোগেন আর এদিক থেকে দেশের মধ্যে তার স্থান ১৯তম।

(৬) শিক্ষা—২০০১ সালে মোদী তার 'ভিশন'-এ জানিয়েছিলেন ২০১০ সালের মধ্যে গুজরাটকে ১০০ শতাংশ স্বাক্ষর করে তুলবেন। কিন্তু ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য বলছে গুজরাটে স্বাক্ষরতার হার ৭৯.১ শতাংশ এবং এই নিরীখে দেশের মধ্যে তার অবস্থান ১৮ নম্বরে। প্রথম স্থানে রয়েছে ৯৩.৩ শতাংশ স্বাক্ষর নিয়ে কেরালা। ২০১০-১১ সালের তথ্য অনুযায়ী গুজরাটে প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিকে ড্রপ আউট ৩৭ শতাংশ, যা ভারতের জাতীয় গড় ৩২ শতাংশ থেকেও বেশ খানিকটা বেশি।

(৭) শ্রমের মূল্য ও মজুরি ঃ তীব্র বঞ্চনার ক্ষেত্র—পুঁজিনিবেশ থেকে কল্যাণমূলক ক্রিয়াকর্ম সবেতেই মাঝারি বা নিম্ন মানের হওয়া স্বত্ত্বেও গুজরাট ও তার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেখতে চাওয়ার জন্য কর্পোরেট জগতের এই উদগ্র তাগিদ কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে শ্রম ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য পরিসংখ্যানগুলোর দিকে তাকালে। (সারণী-৩, ৪, ৫ এবং ৬ দেখুন)

সারণীগুলো থেকে স্পষ্ট শ্রমিকের মজুরি ও অধিকারের দিক থেকে গুজরাট কতটা পিছিয়ে পড়া আর সেখানকার শ্রমিকের অধিকার ঠিক কি অবস্থায় আছে। আজকে নব্য উদারনৈতিক যুগে আগ্রাসী পুঁজিবাদ তার অধিক মুনাফার জন্য সমস্ত কল্যাণমূলক পোষাক ছেড়ে শ্রমিক শোষণের আদিম প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে অতি মুনাফাকে বজায় রাখতে সচেষ্ট। গোটা দেশ জুড়ে শ্রম শোষণের প্রক্রিয়াকে আরও মসৃণ করার জন্য কর্পোরেট জগৎ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী বানাতে চাইছে। শ্রমিক শোষণের নির্লজ্জতম দৃষ্টান্ত হিসেবে গুজরাট মডেলকে তাই তারা নানা মোহিনী মিথ্যার মোড়কে তুলে ধরছে। এই সমস্ত মিথ্যার জালকে অবশ্যই আমাদের ছিন্ন করতে হবে। প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে কর্পোরেটদের বানিয়ে তোলা মোদী মিথের মিথ্যাকে সামনে আনতে হবে। সদ্য প্রয়াত লাতিন আমেরিকার 'কুহক বাস্তববাদের' (ম্যাজিক রিয়ালিজম)-এর কথাকার গার্সিয়া মার্কেজকে মনে রেখে আমরা বলতে পারি মোদীর গুজরাট মডেলের উন্নয়ন গাথায় বাস্তব নেই, আছে শুধু কুহক, শুধু মায়া।

- সৌভিক ঘোষাল

(এই লেখার তথ্যগুলো মূলত 'গুজরাট ডেভেলপমেন্ট মডেল ঃ এ রিয়েলিটি চেক' নামক বই থেকে নেওয়া। বইটিতে জনগণনার রিপোর্ট, ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্টের মতো প্রামাণ্য দলিল তথ্যর আকর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।)

সারণী-১

ক্ষেত্র	গুজরাট গড় (টাকা)	ভারতে গড় (টাকা)	গুজরাট (ক্রম তালিকা)
কৃষি	১.৭৬	১.৫৩	১৭
গৃহস্থালী	৩.৭৩	৩.২০	২১
শিল্প	৫.৩২	৪.৭৯	২২

সারণী-২

রাজ্য	২০০১	২০০৮	হ্রাস/শতাংশে
তামিলনাড়ু	৪৯	৩১	৫৮
মহারাষ্ট্র	৪৫	৩৩	৩৬
কর্ণাটক	৫৮	৪৫	২৯
গুজরাট	৬০	৫০	২০
ভারত (গড়)	৬৬	৫৩	২৫

সারণী-৩
শহুরে ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত

রাজ্য	মজুরি	ক্রম
কেরালা	৩১০	১
রাজস্থান	১৭৪	২০
বিহার	১৫৭	২৫
গুজরাট	১৪৫	৩০
সারা ভারত	১৭০	-

সারণী-৪
গ্রামীণ ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত

রাজ্য	মজুরি	ক্রম
কেরালা	৩১৫	২
রাজস্থান	১৬০	২২
বিহার	১২৬	২৮
গুজরাট	১১৩	৩৩
সারা ভারত	১৩৯	-

সারণী-৫
শহুরে স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত

রাজ্য	মজুরি	ক্রম
হরিয়ানা	৭৭৭	২
রাজস্থান	৪১৭	২৫
বিহার	৪১২	২৬
গুজরাট	৩২০	৩০
সারা ভারত	৪৫০	-

সারণী-৬
গ্রামীণ স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত

রাজ্য	মজুরি	ক্রম
দিল্লী	৫০৩	৮
বিহার	৪১২	১৪
রাজস্থান	৩০৬	২০
গুজরাট	২৫৪	২৮
সারা ভারত	২৯৯	-

তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার সমতার আন্দোলনের নতুন পরিসর

দিল্লীর মেহরৌলি এলাকার বাক্সের মতো বাড়িঘর, কেবল টিভির তার, ফেলে দেওয়া এয়ারকুলারের শবদেহ যদি আপনি অগ্রাহ্য করতে পারেন তবে ঠিক পৌঁছে যাবে ষোড়শ শতকের এক কবরখানায়। হিজরো কি খিনকা। পুরনো ঘোড়ানিম গাছের ছায়ায় ঢাকা সাদা চুনকাম করা পঞ্চাশটি কবর, পঞ্চাশটি কিন্নরের। মসজিদ। তার সাতটি মিহরাব। একদা কারুকার্য করা এখন সাদা চুনকামে ঢেকে যাওয়া লোদি আমলের স্মৃতিচিহ্ন। দিল্লীর ট্যুরিস্টদের পায়ের ধুলো পড়ে না। কিন্তু পরবের দিনগুলোতে দিল্লী আর তার কাছের শহর-মফস্বলের থেকে আসা শয়ে শয়ে কিন্নর এসে জায়গাটাকে জাগিয়ে তোলেন। কবরিস্থানের মধ্যেই গান। হাসি। খাওয়া-দাওয়া। সুফি সন্তের কাছে দোয়া। দূর অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে ওনারা আসেন। এমন এক সময়ের স্মৃতিচিহ্নর কাছে ফিরে আসেন যখন তাদের সমাজের মধ্যে দাম ছিল।

মহাভারতে বৃহন্নলার কথা ছিল। পুরাণে ছিল অর্থ-নারীশ্বরের কথা। তারা কেউ অপরাধী ছিলেন না। ইসলামী সভ্যতায় কিন্নরদের স্থান ছিল সেনাবাহিনীতে, অন্দরমহলে আর ধর্মীয় স্থানেও। হজ করার সময় কাবা মসজিদ পাহারা দিতেন কিন্নর-রা। হাজিরা কাবা মসজিদ পরিক্রমা করার সময় তাদের হস্তচুম্বন করতেন। শুধু তাই নয়। আস্তে আস্তে মামেলুক ইজিপ্ট, ওটোমান তুরস্ক ও মোঘল ভারতে তারা বাদশাহির গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হন। মোঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর হিন্দু কিন্নরদের ঐতিহ্য আর মুসলিম ঐতিহ্যের এক মেলবন্ধন ঘটে। পুরুষের পোষাকের বদলে গায়ে ওঠে নারীর লেবাস। উৎসব বাড়িতে গান গেয়ে আর দোয়া দিয়ে দিন চলতে থাকে। প্রায় একই সময়ে ১৮৭১ সালে ব্রিটিশরা ক্রিমিনাল ট্রাইব অ্যাক্টে পুরো হিজরা সমাজকেই অপরাধীপ্রবণ বলে দেগে দেন। লোধা শবর সহ অনেক আদিবাসী মানুষের সাথে হিজরেরাও অপরাধ না করে অপরাধী বনে যান।

সেই কালি আগেই মোচন হলেও হিজরা সম্প্রদায় নিয়ে সাম্প্রতিকতম রায় শুধু সাধুবাদযোগ্য তাই নয় লিঙ্গসমতার আন্দোলনের কাছে এক বড় প্রাপ্তি। বিচারপতি রাধাকৃষ্ণাণ আর সিক্রির বেঞ্চ মূলত দুটি বিষয়ে রায় দিয়েছেন। রূপান্তরকামী পুরুষ/নারীদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে পরিচিত হওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি এবং তার ওপর ভিত্তি করে আইনি স্বীকৃতি। এই আইনি অধিকারের ফলে স্বাভাবিকভাবে বিবাহ সংক্রান্ত আইন, দত্তক নেওয়ার অধিকার, আইনি পরিচয়পত্র যা কেবলমাত্র পুরুষ/নারী বাইনারির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। ৩৭৭ ধারা নিয়ে নাজ ফাউণ্ডেশানের মামলার মত এই রায়েও বিচারপতিরা সংবিধানের ১৪ নং ধারার (সমতার অধিকার) প্রসঙ্গ এনেছেন। তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি না দিলে কিন্নরদের সংবিধান সম্মত সমতার অধিকার ব্যাহত হচ্ছে। এবং ১৫ ও ১৬ নং ধারা যেখানে বলা হয়েছে কারুর লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যায় না, সেই প্রসঙ্গ বিচারপতি তুলেছেন। সেইখানে লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগরিকদের নিজস্ব যৌন আত্মপরিচয়ের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট এও নির্দেশ দিয়েছে তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তা দূর করার ব্যবস্থা করুক সরকার।

সুপ্রীম কোর্টে ৩৭৭ ধারা সম্পর্কে বিচারপতি কৌশলের রায়ের বিপ্রতীপে এই রায় অবশ্য সাধুবাদযোগ্য। যদিও আইনি অধিকার পাওয়া মানেই বাস্তবের মাটিতে সেই অধিকার পাওয়া নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পরেই চলে অধিকার অর্জনের দীর্ঘ লড়াই। দলিত আন্দোলনের চাপে ১৯৮৯ সালের দলিত নিপীড়ন বিরোধী আইন এলেও তাকে রূপায়ণের লড়াই আজও চলছে। তার পরেও লক্ষ্মণপুর-বাথে হয়েছে, খইরলাঞ্জি হয়েছে। তাই তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের অধিকারের লড়াই শুরু হল মাত্র, এই কথা বলা যায়। কিছুদিন আগেই বিভিন্ন বাংলা খবরের কাগজে রিপোর্ট বেরোচ্ছিল রাস্তার মোড়ে মোড়ে হিজরেদের ভিক্ষা করা আর জোর জুলুম করার খবর। করুণা মিশ্রিত ঘৃণা মিশে ছিল রিপোর্টগুলোতে। কিন্তু আমাদের সমাজে একজন রূপান্তরকামী দরিদ্র কিশোরের কাছে আর কি উপায় থাকে? ভিক্ষা আর দেহ-ব্যবসার বাইরে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু সমাজ আর পরিবারের অত্যাচার থেকে বাঁচতে রূপান্তরকামী কিশোর বাড়ি ছেড়ে পালায়। যোগ দেয় হিজরে সমাজে। তাদের কাছে 'হিজরে' এই পরিচয়ের বাইরে বিভিন্ন কাজে সমানভাবে জায়গা করে নেওয়ার যে সুযোগ এতদিন বন্ধ ছিল তা খোলার এক প্রক্রিয়া শুরু হল এই আশা রাখা যাক।

এই সুযোগে আর একটা দিকে নজর ফেরানো যাক। এটা কোনও সমাপতন নয় যে ১৬ ডিসেম্বর পরবর্তী নারী আন্দোলনের সময়পর্বেই সমকামী/রূপান্তরকামী নাগরিকদের অধিকারের আন্দোলনের প্রতিও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী এক পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে। সমাজবাদী পার্টি, বিজেপি সহ সংঘ পরিবারের মত কিছু গোষ্ঠীকে বাদ দিলে অধিকাংশ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলেছেন। আমাদের পার্টি আমাদের নির্বাচনী ইস্তোহারেও ৩৭৭ বাতিলের দাবি তুলেছে। ১৬ ডিসেম্বর পরবর্তী আন্দোলন ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলন হিসেবে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে নেয়নি। সেই আন্দোলনের মধ্যে থেকেই স্বর উঠে এসেছিল বেখৌফ আজাদির। এবং এটা শুধু আন্দোলনের মধ্যে থাকা কিছু রাজনৈতিক কর্মীর আত্মগত বাসনার অভিব্যক্তি ছিল না। অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এই শ্লোগানকে নিজের করে নেন। নিজের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বাছার অধিকারও এই খাপ পঞ্চায়েতের যুগে নারী আন্দোলনের অন্যতম দাবি। আর এই সূত্রেই সমকামী-রূপান্তরকামী মানুষের অধিকার আন্দোলন এসে মেশে লিঙ্গসমতার আন্দোলনের পরিসরে। দীর্ঘদিন ধরে সমকামী অধিকার আন্দোলন আর নারীবাদী আন্দোলন আমাদের দেশে একবিন্দুতে মেলেনি। ফলে সমকামী অধিকার আন্দোলনের লড়াই সীমাবদ্ধ থেকেছে এন জি ও আর অ্যাকাডেমিক সন্দর্ভের মধ্যে। সেই অবস্থার পরিবর্তন পরিস্থিতির জন্য নিজেই ঘটছে। কিন্তু এই পরিঘটনায় এক সচেতন উপাদান যুক্ত করাও প্রয়োজন।

পুরুষতন্ত্র আর মোরাল মোড়লরা ঠিক করে দেবে না মানুষের জীবন। তার যাপন। তার হাতে ধরে থাকা সঙ্গীর হাত। 'হিজড়ে'-দের মধ্যযুগীয় কবরিস্থানে নয়। সামনের দিনে তাদের উৎসব হবে প্রতিদিনের বেঁচে থাকায়। কাজের জগতে। আর তাদের এই লড়াইতে পাশে থাকবে লিঙ্গসাম্যর আন্দোলনের কর্মীরা। দ্বিতীয় লিঙ্গ আর তৃতীয় লিঙ্গের সমতা ও মর্যাদার আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।

- দ্বৈপায়ন

আইন আদালত ও একটি সরকার

দেশের একটা সংবিধান আছে, আইন আছে। কমিউনিস্টরা তাকে খুব ভালো চোখে দেখে তেমনটা নয়, কিন্তু মন্দের ভালো হিসেবে শাসকদের তাকে মানতে বাধ্য করতে সচেষ্ট হয়, আর একই সঙ্গে সেই আইন কানুনকে ইতিবাচক দিকে পাল্টাতে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তাই কমিউনিস্টদের জেলে যেতে হয়, মরতে হয় রাষ্ট্রের হাতে গুলি খেয়ে। এসব কথা আমাদের জানা। কিন্তু যারা রোজ আইন মেনে চলার কথা বলেন, সংবিধানকে শালগ্রাম শিলার মতন যত্নআত্তি করেন, সেই শাসকরা যখন বারংবার আদালতের দ্বারা ভর্ৎসিত হন, আদালতে পর্যুদস্ত হন তখন বোঝা যায় ঐ শাসক মিথ্যা ছাড়া সত্যি বলে না, নিজের আইনকে নিজেই প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করে। ঠিক এমনটাই বর্তমান রাজ্য সরকারের সম্পর্কে বলা যায়। ক্ষমতার গদিতে বসার পর থেকে গত তিন বছরে সমস্ত পুলিশ আইন আদালত কমিশনে নাজেহাল হয়েছে এই সরকার। একদিকে অপরাধীকে আড়াল করতে চেয়েছে, অন্যদিকে সমস্ত বিরোধিতাকে এমনকি সততাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে, সেক্ষেত্রে এই সরকার থেকেছে 'নিরপেক্ষ', নিজের দলের লোককে কোতল করতেও দ্বিধা করেনি শাসক। ধনেখালিতে তৃণমূলের নাসিরুদ্দিনকে খুন করা হয়েছে, অভিযুক্ত হয়েছে তৃণমূলের বিধায়ক অসীমা পাত্র। আদালতে হেরেছে রাজ্য সরকার, পুলিশ অফিসাররা কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে তিরস্কৃত হয়েছে। মামলা সি বি আই-এর হাতে তুলে দিয়েছে আদালত। পার্ক স্ট্রীট ধর্ষণ কাণ্ডে এখনও মূল অভিযুক্ত পলাতক। দুবছর হয়ে গেল কেউ সাজা পায়নি। উপরন্তু সরকার মুখ পুড়িয়েছে তদন্তকারী অফিসারকে অপসারিত করে। আর সততার প্রতীক বলেছেন ঘটনাটা সাজানো। এরপরে খরজুনা, কাটোয়া, গেদে, গাইঘাটা ... এক লম্বা সারণী। কোথাও ধর্ষকরা এখনও শাস্তি পায়নি। কামদুনির ধর্ষকদের একমাসের মধ্যে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণার পরে বছর ঘুরেছে, মুখ্যমন্ত্রী যে কথা রাখেন না তা যথারীতি প্রমাণ হয়েছে। পাড়ুইয়ে তৃণমূল কর্মীর বাবাকে মেরেছে তৃণমূলের গুণ্ডারা। গুণ্ডাদের মোড়লকে প্রোটেকশন দিচ্ছেন 'মা-মাটি-মানুষে'র নেত্রী। সেই মামলায় জেরবার হয়েছে সরকার, তারপরে মামলাটাকে অন্য আদালতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি বীরভূমের একজন সি পি এম কর্মী খুনের ঘটনায় হয়তো বা আদালতের ধমকের ভয়েই রাতারাতি অভিযোগের ধারাকেই পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এরকম তালিকা করলে হাজারো একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাবে।

আর সারদার কথা তো আজ সর্বজন বিদিত। এখন মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরাও সারদামণির থেকে সারদার কথা বেশী জানেন। সারদা গরিব সাধারণ মানুষের টাকা মেরেছে, কিন্তু সেইসব টাকা গেছে কোথায়? সেটা জানা নেই। থুড়ি, জানা থাকলেও তা মানতে নেই। ভাগ্নে মদন বেশী পেয়েছে না মুকুল তা বলা দুস্কর। দিদি বলেছিলেন, আমি চোর? মুকুল চোর? কুণাল চোর? টুম্পাই চোর? এদের মধ্যে একজন দিদির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে জেলের হাজতে রয়েছেন, বাকীদের নামও প্রায়শই শোনা যাচ্ছে। অবশ্য মহাশ্বেতা দেবী হুম ইট মে কনসার্ন বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে মমতা সৎ। সারদা সামলাতে এই সরকার করদাতাদের টাকায় দাতব্য করতে শুরু করেছে। সেখানেও আদালতের গেড়ো। আদালত বলে দিয়েছে খালি সারদায় ধোঁকা খাওয়া বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দিলেই হবে না, অন্য সব চিটফাণ্ডের প্রতারিত আমানতকারীদেরও ফেরত দিতে হবে। আবার অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের সাড়াশি আক্রমণে রাজ্য সরকার যারপরনাই ভীত। তাই মুখ্যমন্ত্রী আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছেন।

এইসব ঘটনার ঘনঘটার আগেই দিদিমণি তৎ কর্তৃক নিযুক্ত মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান দ্বারা যারপরনাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে শুরু করে জঙ্গলমহলের গরিব কৃষক শিলাদিত্য পর্যন্ত কাউকেই রেয়াৎ করেন নি, সবাইকেই সমভাবে দেখেছেন, আর তাদের থানা বা জেলে টানাটানি করেছে তাঁর পুলিশবাহিনী। প্রতি ক্ষেত্রেই মানবাধিকার কমিশন সরকার বা তার পুলিশকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। অতএব, দিদিভাই সেই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সব মিলিয়ে আইন আদালত কমিশন সব যন্ত্রপাতির সঙ্গেই তৃণমূল সরকার ঝগড়া লাগিয়ে ফেলেছে, কেবল পুলিশ আর আমলাদের রসে বশে রেখেছে যাতে তাঁরা করে কম্মে খেতে পারে। টেট, সেট, প্রাইমারি, সেকেণ্ডারী সর্বত্রই ঘোল খাচ্ছে এই সরকার। এমন অবস্থা বানিয়েছে যে, ফৌজদারী আসামীকে শাস্তি দেওয়ার থেকে তার ছাড় পাওয়ার দিকেই পুলিশ ও সরকারি উকিলদের তাগিদ বেশী হচ্ছে। ফলে কোন মামলাই সহজে নিষ্পত্তি হয় না। আদালতের লালচোখ আস্তে আস্তে সরকারের তাঁবেদারদের গা সহা হয়ে গেছে। তবে মানুষ সবই দেখছে। তাঁদের সহ্যের সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করতে চলেছে এই সরকার।

- অমিত দাশগুপ্ত

... জোনাল সম্মেলন

দুয়ের পাতার পর

সময়মতো কাজ না হওয়া, প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার অনুদান চালু করা, আর্থিক পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং অধিকার লড়াই করে ছিনিয়ে আনার কথা বক্তারা উল্লেখ করেন। সি পি আই (এম এল) বর্ষীয়ান নেতা দাউদ আলি মণ্ডল সংগঠনের শৃঙ্খলা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। রাজ্য সম্পাদক কিশোর সরকার বলেন—সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে লক্ষ কোটি টাকার যে নির্বাচনী যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেখানে কোথাও শাসক দলগুলো নির্মাণ শ্রমিক সহ শ্রমজীবী মানুষের কথা উচ্চারণই করছে না। নির্মাণ শ্রমিকদের রক্তের বিনিময়ে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ (সেস) সংগ্রহ হয় তার মাত্র ৭/৮ শতাংশ অর্থ শ্রমিকদের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সমস্ত অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের জন্য কল্যাণ পর্ষদ গঠন করে সমান অনুদান চালু করতে হবে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাজেটে বিশেষ তহবিল ঘোষণা করতে হবে। তিনি বলেন, শ্রমিকের মর্যাদা, সামাজিক সুরক্ষা আদায় করতে রাস্তার আন্দোলনই একমাত্র পথ। শেষে সম্পাদক ইন্নাস সেখ সহ ১৯ জনের কমিটি তৈরী হয়।

উল্টোদিকে তৃণমূলের নির্বাচনী সভাকে অবজ্ঞা করে লালঝাণ্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে শতকণ্ঠে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরবর্তী সংখ্যা ''আজকের দেশব্রতী'' প্রকাশিত হবে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ২২ মে '১৪ (বৃহস্পতিবার)।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত শোকসংবাদে প্রয়াত কমরেড সুশান্ত নন্দী ছিলেন হুগলি জেলার পার্টি সদস্য।

... ঔদ্ধত্য মোদী-মমতার

একের পাতার পর

সিঙ্গুরের জমিকে এখনও কর্পোরেট কব্জা মুক্ত করা হয়নি। এখনও তা সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন। বিষয়টা আইন-আদালতের অনিশ্চয়তার গেরোয় ফেলে রাখা হয়েছে। সিঙ্গুর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আর রাজনৈতিক কেরামতি প্রদর্শন করতে পারছে না। এটা তাদের একটা ঘোর অসুবিধার দিক। খোঁচা খাওয়ার পরিস্থিতিতে পড়লে আরও অস্বস্তিকর। ক্ষতিগ্রস্ত জনতাকে দু টাকা কিলো দরে চাল আর এটা-সেটা বিক্ষিপ্ত দেওয়া-থোয়ার বিনিময়ে সরকার নির্ভর করে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সিঙ্গুর প্রশ্নে আন্দোলনের যে কোন পুনরুত্থানমুখী প্রয়াস তৃণমূলের চক্ষুশূল। অবশ্য এখন শুধু সিঙ্গুর কেন, এই জমানায় যে কোন আন্দোলনই সরকারের চোখে 'ষড়যন্ত্র'। আন্দোলনের গন্ধ পেলেই শাসকদল ফেলছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, প্রচার চালাচ্ছে হাড়হিম ধরানো। তাই সিঙ্গুর প্রশ্নে মোদীর প্রস্তাবের মুখে ঝামা ঘষে দিতে মমতা অক্ষম, অথর্ব। এটা বলতে পারছেন না যে সিঙ্গুরের ফয়সালা করুক এবার সিঙ্গুরের জনতা। এটা তাদের অধিকারের এবং আদায় করে নেওয়ার বিষয়। সিঙ্গুর জট কীভাবে যে ছাড়াবে সেই রাস্তা শাসকদল বাৎলাতে পারছে না। তবে কী ঝোলায় সাজানো হচ্ছে কোন গোপন সমঝোতার প্রস্তাব! সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, তৃণমূল আমল জমি-কৃষি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি পলিসিগত প্রশ্নে আদৌ কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ বিরোধী নয়। বরং যে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ পলিসি শিরোধার্য করছে তা কর্পোরেট পুঁজি ধরতেই। দ্বিতীয়ত, খোদ টাটার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে অন্য উপলক্ষ্যকে ব্যবহার করার হাল তৃণমূল ছেড়ে দেয়নি। তৃতীয়ত, ফিকির প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেলকে অর্থমন্ত্রী মায় শিল্পমন্ত্রী করা হয়েছে—কর্পোরেটশ্রেণীর কথা ভেবেই। চতুর্থত, কর্পোরেটশ্রেণীর জন্য 'চাইলেই সব সুবিধে মিলবে' মার্কা এক জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু একটা স্তোকবাক্য শোনাতে বাধ্য, তাই শোনানো—'জোর করে জমি নয়'। মানে, টাকায় মগজ কিনে হাতিয়ে নিতে পারলে নিচ্ছে, নেবে—কেউ বাধা দিচ্ছে না, দেবে না। সরকারপক্ষ বরং মোড়লী ফলাবে। এই যে সারদা চিটফাণ্ড সংস্থা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুরের ব্যাপক পরিমাণ জমি হাতালো, সেখানে তো শাসকদলের বিধায়কই মোড়লী করেছে, এক জানালায় কোনকিছুই আটকায়নি। যাই হোক, দুর্বলতার কারণে বা অস্বস্তির জন্য বা চালাকির আশ্রয় নেওয়ার অনিবার্যতায় হোক, এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলী ইস্তাহারে ও প্রচারে সিঙ্গুরকে সুপরিকল্পিতভাবেই সামনে আনা হচ্ছে না। 'মা-মাটি-মানুষের' আলখাল্লাটা খসে পড়ছে।

তৃণমূল নিজেকে প্রচারে জাহির করছে কেন্দ্রে সরকার গঠনের রিমোট কন্ট্রোল নিজের হাতে থাকবে এমন ফলাফল করবে। সে কী করবে ফলাফল প্রকাশে বোঝা যাবে। কিন্তু মমতা দেবী এটা আগাম কিছুতেই খোলসা করছেন না যে সরকার গঠনের প্রশ্নে কোনও অবস্থাতেই মোদীজীদের সঙ্গে যাবেন না। এরকম এক ধোঁয়াশা তৃণমূলের দিক থেকে রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূলকে মোকাবিলা করতে বিজেপি পলিসি প্রয়োগ করছে দ্বিমুখী, একদিক থেকে চাপ দাও, ভাঙ্গো; অন্যদিক থেকে টোপ দাও, টানো। তৃণমূল বিরোধী অসন্তোষকে বিজেপি কত কী ভোটে টানতে পারবে তা সময়েই জানা যাবে। কিন্তু মোদীর কর্পোরেটমুখী 'উন্নয়ন পলিসি' ভয়ঙ্কর খুল্লামখুল্লা। তার একটা নমুনা হল, 'আদানী' শিল্পগোষ্ঠীকে মোদী সরকার জমি দিয়েছে প্রতি স্কোয়ার ফুট মাত্র এক টাকায়!

তৃণমূলের সিঙ্গুরের জট থেকে আসা যাক সারদার ফাঁসের কথায়।

সারদা চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারী পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আর্থিক লুঠের কেলেঙ্কারী। লুঠের এই সাম্রাজ্য ছড়িয়েছে অসম, ওড়িশায়, আরও অন্যত্র। তবে এই প্রতারণা ও লুঠের মূল মৃগয়াভূমি পশ্চিমবঙ্গই। শুরুটা বিগত বামফ্রন্ট আমলে, বল্গাহীন ব্যাপক বিস্তার বর্তমান তৃণমূল রাজত্বে।

এ পর্যন্ত তদন্ত সূত্রে তথ্য মিলেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রীম কোর্টে হলফনামায় যা জানিয়েছে, তাতে সারদা প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ আমানতকারীর থেকে ২৪৬০ কোটি টাকা তুলেছিল। তার মধ্যে আমানতকারীদের ফেরত দিয়েছে দাবি করেছে ৪৭৫ কোটি টাকা। বাকী ১৯৮৫ কোটি টাকার কোন খবর নেই। সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবীদের একাংশের অনুমান আমানতকারীদের সংখ্যা ও অর্থ লুঠের পরিমাণ আরও বহুগুণ বেশী। আমানতকারী প্রায় ২০ লক্ষাধিক, লুঠের পরিমাণ ২০ থেকে ২৫-৩০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। প্রকৃত সত্যাসত্য প্রকাশ নির্ভর করছে যথাযথ তদন্তের উপর। লুঠেরা সারদা মালিক পরিবারের লোকেরা এই লুঠের দৌলতে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বানিয়েছে কত সেসব এখনও সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

এজেন্টদের নির্ঘোষে সারদার লুঠের খবর যখন বিস্ফোরণের মতন প্রকাশ হয়ে গেল তখন 'মা-মাটি-মানুষের' সাইনবোর্ড লাগানো সরকার সেস পরিস্থিতির কীভাবে মোকাবিলা করবে প্রথমে স্থির করে উঠতে পারেনি। অগত্যা মুখ্যমন্ত্রী আমানতকারীদের আবেদন খতিয়ে দেখতে ও ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিতে 'শ্যামল সেন তদন্ত কমিশন' বসিয়ে দিলেন। আর বাজেট বহির্ভূত ৫০০ কোটি টাকার সরকারি তহবিল বরাদ্দ করলেন। ভেবেছিলেন এভাবেই নিস্তার মিলবে। কিন্তু সারদাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি গড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশার পুরো বিপরীতে। কোনও ছক কষা পলিসি পদক্ষেপ কাজের কাজ দেয়নি। সারদা মালিকের অন্তর্ধান ও গ্রেপ্তারীর ঘটনা থেকে শুরু করে, সি বি আইকে চিঠি দেওয়া, ফাঁসালে অন্যদেরও ফাঁসিয়ে দেওয়ার আভাস, প্রথমে সি বি আই তদন্তে রাজী হওয়া, পরে শাসক দলের নেপথ্য চাপে রাজ্য সরকারের তদন্তে সম্মত হওয়া, মোট ৩২০টি মামলা খাওয়া; তাছাড়া শুধু সারদার নয়, সারদাকে কেন্দ্র করে বর্তমান শাসকদলের নেতা-মাথা-সাংসদ-মন্ত্রী সহ প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও 'সেবি'-র অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের হিস্যায় জড়িয়ে পড়ার সাতকাণ্ড আমজনতার জানা-বোঝা হয়ে গেছে। আঁতাতের জাল অনেক বিস্তৃত, বহু গভীরে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাধারীরা কত বড় ধেড়ে বজ্জাত, কত কী বখরা—মাসোহারা পেতেন সবই এখন সারদা পরিবারের সদস্যদের স্বীকারোক্তিতে গলগল করে বের হচ্ছে। এমনকি ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট)-র জিজ্ঞাসাবাদের চিঠি পেয়েছেন তৃণমূলের এক লোকসভা নির্বাচনী নাট্যকর্মী প্রার্থী। সারদা পরিবারকে আগাগোড়া প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করার অভিযোগ উঠছে রাজ্যের এক ডাকসাইটে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলে অঘোষিত দু'নম্বর নেতা বলে বহুল পরিচিত ক্ষমতাবানের সাথে সারদা মালিক ও বর্তমানে জেলহাজতে থাকা এক সাংসদের গোপন বৈঠক হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সারদাকাণ্ডকে জড়িয়ে সরকার বা শাসকদলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে প্রথম থেকেই বানচাল করতে লিপ্ত। তার জন্য যেমন ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্তের কৌশল নেন, অন্যদিকে দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিতে এই নাটকীয় সংলাপও শুনিয়েছিলেন, 'কুণাল চোর! টুম্পাই (সৃঞ্জয় বসু) চোর! মুকুল চোর! আমি চোর!' কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে নির্মম রসিকতা করল। মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ দিয়েই সাংসদ কুণালের মুখ বন্ধ করাতে কুণালকে বলি দিতে হয়েছে। তাকে হাজতে পোরা হয়েছে, জবানবন্দী দিতে দেওয়া হচ্ছে না। কুণাল অপরাধী সন্দেহ নেই, তবে কেবল একা অপরাধী নয়, অপরাধে জড়ানোর ক্ষেত্রে দল বা মন্ত্রীদের অনেক মাথাই রয়েছে। আর সবকিছুই যেখানে দলের একমোবদ্বিতীয়ম নেত্রীর ফরমানে চলে, সেখানে সারদাকাণ্ডে দলের জড়িত থাকাটা নেত্রীর অজ্ঞাতসারে ঘটেছে হতেই পারে না। বরং মুখ্যমন্ত্রী যতই কেচ্ছা চাপা দিতে গেছেন ততই পর্দা ফাঁস হয়ে চলেছে।

ইডির তদন্ত এখনও এমনকিছু জোরদার হয়নি। অথচ তাতেই তৃণমূল প্রমাদ গুণছে। কারণ বহু তথ্য বেরিয়ে আসছে, আরও অনেক সন্দেহ দানা বাঁধছে। গোপন তথ্য যত প্রকাশ হচ্ছে ততই সি বি আই তদন্তের দাবি জোরদার হচ্ছে। ইডি-র কার্যকলাপকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে চিহ্নিত করে মানুষের সহানুভূতি কুড়োতে চাইছেন। এখন ইডি, সি বি আই এগুলো কেন্দ্রীয়স্তরের সংস্থা বলে এই ব্যবস্থাগুলোকে কেন্দ্রের কলকাঠি নেড়ে ব্যবহার করার একটা চল রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক। কারণ প্রথমত, একই অভিযোগ ভুরি ভুরি উঠেছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও, তদন্তে রাজ্যের পুলিশকে ব্যবহার করার প্রশ্নে। দ্বিতীয়ত, রাজ্য পুলিশের তদন্তের ভূমিকা কত গাফিলতিতে ভরা এবং শাসকদলের পক্ষপাতদুষ্ট সেটা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের ভর্ৎসনায় প্রমাণ হয়ে গেছে। তৃতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও অভিযোগের দায় এড়াতে এবং রাজ্য পুলিশের ভূমিকাকে আড়াল করতে প্রায়শ যুক্তি দিয়েছেন এসব চিটফাণ্ড কেস তো দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রের। আবার সেইমতো যখন সক্রিয় হয়েছে ইডি, দাবি উঠছে সি বি আই তদন্তের, তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজের পাতা জালে নিজেই বন্দী হয়ে যাচ্ছেন। জ্বলুনি হচ্ছে, মুখ পুড়ছে, তবু তড়পানি যাচ্ছে না। আরেকটা কায়দা তিনি নিচ্ছেন। যাদের নামে অপরাধের অভিযোগ উঠছে, তা সে জেলার মস্তান পাণ্ডা নেতা হোক বা মাফিয়া মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী তাদের নির্বাচনী সভামঞ্চে নিয়ে ঘুরছেন।

সারদাকাণ্ডের এখনও যা সব তথ্য বেরিয়েছে তা কেবল দৃশ্যমান আংশিক মাত্র। অবশ্যই সবটাই উদ্‌ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

পাঠকের চিঠি ও লেখকের বক্তব্য

জনৈক সঞ্জীব সিনহা মেল করে আমার একটি লেখা সম্পর্কে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উত্তর জানতে চেয়েছেন। লেখাটি ''নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জীর জেহাদ, উদ্দেশ্য তৃণমূলের হাওয়া তোলা'' শিরোনামে ১০ এপ্রিল ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিতে পত্রলেখক যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা এইরকম—

১। আমরা নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ রূপে দেখিয়েছি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কি সত্যিই নিরপেক্ষ? তারা কি 'কেন্দ্রীয় শাসকের' পক্ষে কাজ করছে না? তারা কি কংগ্রেস বা বিজেপির দিকে ঝুঁকে নেই?

২। কংগ্রেস যখন এই রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ছিল, তখন তারা (নির্বাচন কমিশন) অনেক অফিসারকে বদলি করেছিল এবং সেই পদক্ষেপ কি কংগ্রেসের নৈরাজ্যের বিপক্ষে গিয়েছিল?

৩। লেখাটিতে যা বলা হয়েছে তা অর্ধসত্য এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে আড়াল করা হয়েছে।

আমার বক্তব্য

নির্বাচন কমিশন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হলেও এই রাষ্ট্রেরই সংবিধান প্রসূত একটি প্রতিষ্ঠান। মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীগুলোর দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীশক্তিসমূহকে দমনের যন্ত্র হিসেবেই দেখে। সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ার একটি স্তরে রাষ্ট্রের জন্ম হলেও রাষ্ট্রকে দেখানো হয় সমাজের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোকে প্রশমিত করতে তাকে কাজে লাগানো হয়।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে জনগণের চোখে রাষ্ট্রকে বৈধ করে তোলার প্রচেষ্টা হিসেবেই দেখতে হবে। নির্বাচন কমিশন ১৯৫০ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হলেও তার অতি সক্রিয়তা ও কঠোরতার ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে। ১৯৯১ সালে টি এন শেষণকে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার করা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাঁর কিছু কঠোর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এক জাতীয় নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার সঙ্গে জনগণের কাছে রাষ্ট্রের বৈধতা অর্জনের লক্ষ্য কোন সচেতন পর্যবেক্ষকের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। সময়টা লক্ষ্য করুন। নির্বাচন প্রক্রিয়া হিংসাপ্রবণ হয়ে উঠে ১৯৯১ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩৫০ জন মানুষ মারা গেল, বিহার-উত্তরপ্রদেশের মত রাজ্যগুলো থেকে ব্যাপক সংখ্যক বুথ দখলের খবর বেরোল, বাহুবলীরা নির্বাচনী ময়দানে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, অর্থ ও পেশি শক্তির নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কলুষিত করা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে চর্চা হতে লাগল—আর এই সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের নায়কদের বিশ্বের বৃহত্তম পরিষদীয় গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজতে বাধ্য করল। নির্বাচন কমিশনের সক্রিয়তার মধ্যে তাঁরা সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, নারী কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন, আদিবাসী-জনজাতি-পশ্চাদপদ জাতিগুলোর দুরবস্থা নিরসনে গঠিত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রকল্প—এই সমস্ত পদক্ষেপ বাস্তব পরিস্থিতির রূপান্তরণে তেমন কার্যকরী না হলেও রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়াস।

যে প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিকভাবেই এখন সামনে আসে তা হল—নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যে ব্যধিগুলোর কথা উপরে উল্লিখিত হল, নির্বাচন কমিশন সেগুলো থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে মুক্ত করতে কি পেরেছে? বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা রহিত ও বাস্তব সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই এর উত্তরে 'হ্যাঁ' বলবেন না। ব্যাধিগুলো যে অত্যন্ত প্রকটভাবেই রয়েছে তা ছাপা ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে চোখ রাখলেই ধরা পড়ে এবং কর্পোরেট অর্থে যারা যত বেশি পুষ্ট তাদের প্রতিপত্তিও সেখানে সবথেকে বেশি বলে নজরে আসে। তবে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার আমাদের রয়েছে এবং আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন পত্রিকায় তার পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রশ্ন কখনও কখনও তোলাও হয়েছে। আদালত সহ রাষ্ট্রের যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের রয়েছে এবং সেই অধিকার আমরা কখনই ছেড়ে দেব না।

রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের নৈরাজ্য বলতে পত্রলেখক সম্ভবতঃ ১৯৭২-৭৭ পর্যায়কেই বুঝিয়েছেন। সে সময় তাদের সার্বিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে শাসকরা একটা ফ্যাসিবাদী সমাধানের চেষ্টা করেছিল এবং সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের আধা-ফ্যাসিবাদী জমানার মধ্যে দিয়ে তা প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং সেই শাসনের সামনে রাষ্ট্রের সমস্ত শাখাই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আজও সেরকমই একটা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যখন শাসকরা তাদের সংকটের জন্য একটা ফ্যাসিবাদী সমাধানই খুঁজছে।

রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের প্রতিষ্ঠান হলেও শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলো সেখানে মজুত থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকট হয়ে সামনে আসে। ঐ দ্বন্দ্বগুলোকে কাজে লাগিয়ে নেওয়া মার্কসবাদীদের কর্তব্য। তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরাচারী প্রবণতার যে কথাগুলো আমি আমার লেখায় দেখানোর চেষ্টা করেছি, এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে বিচার করতে হবে। 'পরিবর্তনে'র জন্য রায় নিয়ে ক্ষমতায় বসলেও মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন জমানা শাসকদের চিরাচরিত শাসন ধারা থেকে একটুও সরেনি, সেরকম কোন ইচ্ছাও তার নেই। আর পাঁচটা শাসক দল যেমন রাষ্ট্রকে ধরে লুঠপাটে তাদের হিস্যা পুরোপুরি বুঝে নিতে চায়, তৃণমূল কংগ্রেস তার থেকে কোন অংশেই ব্যতিক্রম নয়। এই প্রক্রিয়ায় জনগণের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তার সংঘাত যদি তার স্বরূপকে উন্মোচিত করার সুযোগ হাজির করে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবী গণতন্ত্রের পক্ষে জনমতকে সংহত করাটা মার্কসবাদীদের অবশ্য কর্তব্য। সেই চেষ্টাই আমার লেখায় আমি করেছি।

পরিশেষে, সঞ্জীববাবুকে তাঁর চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানাই। পত্রিকার সঙ্গে পাঠকদের মতামতের আদানপ্রদান যত ঘটবে, পত্রিকা ততই সমৃদ্ধ হবে। এই ধরণের মতামত আমাদের কাছে স্বাগত এবং আমরা তার প্রত্যাশী।

- জয়দীপ মিত্র

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

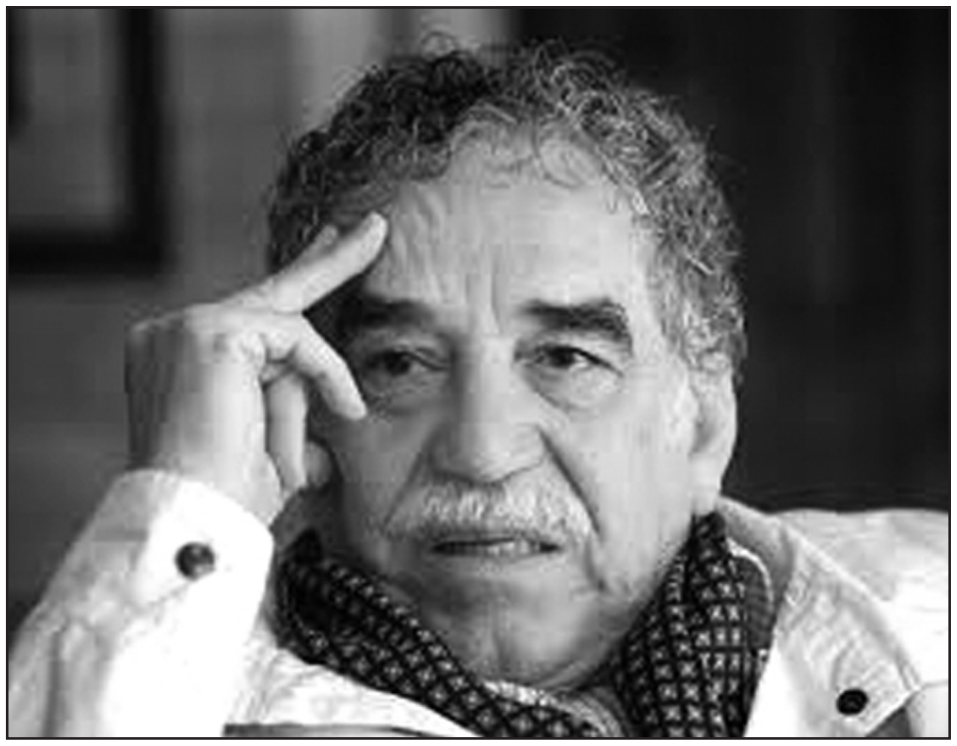

পাবলো নেরুদার স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে গাবো প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছিলেন জনৈকা ফ্রাউ ফ্রিডা-র কথা। ফ্রিডা ছিলেন স্বপ্নদর্শী, স্বপ্নচারিণী। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, স্বপ্ন ফেরি করতেন, স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যৎ দর্শন করতেন। ভিয়েনায় এক অপরিচিত বাড়ির দরজায় এসে তিনি আশ্রয় চেয়েছিলেন। অপরিচিতাকে আশ্রয়! তিনি কী কাজ জানেন জিগগেস করায় ফ্রিডা বলেছিলেন ঃ আমি স্বপ্ন দেখি। এই ভিয়েনায় থাকাকালীন এক পান্থশালায় গাবো দেখতে পান ফ্রিডাকে। ফ্রিডা কোথাও যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কেমনভাবে যেন উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়ে যেত। এরকম এক উৎসবমুখর রাতে বিয়ারের আসরে ফ্রিডা হঠাৎ গাবোর কাছে এসে তাঁকে বলেছিলেন ঃ কাল রাতে আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি, তুমি এখনই ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাও, বছর পাঁচেকের মধ্যে এখানে তুমি আর এসো না। —ফ্রিডার কথা শুনে গাবো আর দেরি করেননি, রোমগামী ট্রেনে ভিয়েনা ছাড়েন। গাবোর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল ফ্রিডার কথা না-শুনে ভিয়েনায় থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর কোন বড়ো রকমের বিপদ হতো। এরপর আর কোনওদিন তিনি ভিয়েনায় যাননি। ফ্রিডার হাতে একটি আংটি পরা থাকতো। আংটি-টি তৈরি করা সাপের আদলে, আর সাপের চোখের বদলে তাতে বসানো ছিল একটি পান্না। হোটেল রিভিয়েরার সামনে দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হওয়ার পর ওই আংটি দেখেই তাঁকে সনাক্ত করা গিয়েছিল। এর কিছুদিন পর একটি কূটনৈতিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গাবো পর্তুগিজ রাষ্ট্রদূতকে এই ফ্রিডার কথা জিগগেস করেছিলেন ঃ এই ভদ্রমহিলার পেশা কী ছিল? উত্তর এসেছিল ঃ তিনি শুধু স্বপ্ন দেখতেন।

ফ্রিডা-র এই কাহিনীর মধ্যেও চারিয়ে গেছে এক যাদুতান্ত্রিকতা, রহস্যময়তা। তাঁর মৃত্যুর বাস্তবতার মধ্যেও এই যাদু ও রহস্যময়তা এক স্বপ্নের বুননে সজীব থেকেছে।

এই গাবো হলেন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এই যাদুতান্ত্রিকতা, রহস্যময়তা, স্বপ্নচারিতা যাদুবাস্তবতার আখ্যানরীতিতে বারবার মূর্ত হয়েছে। একে অবশ্য অনেকেই লাতিন আমেরিকার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর 'একাকিত্বের একশ বছর' উপন্যাসের ভূমিকায় হোয়াকিন মার্কো লিখেছিলেন ঃ মার্কেজ লাতিন আমেরিকার নতুন সাহিত্য ধারায় যাদুকর হিসেবে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু মার্কেজের লেখার শেকড় সবসময়ই থেকেছে মাটিতে। গল্পবলার একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলেও লোকজীবনের বাস্তবতার ওপর যাদুবাস্তবতা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। কল্পনাকে সৃষ্টির অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করলেও তিনি কখনও বুকে কল্পনাকে প্রশ্রয় দেননি। ১৯৮২-র পর নোবেল বক্তৃতাতে তিনি বলেছিলেন ঃ দুঃখ এবং সৌন্দর্যের বিমিশ্রণে সৃষ্টির অতৃপ্তিজনিত যন্ত্রণাই তাঁর রচনার উৎস এবং উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে। কবি, ভিখারি, গায়ক, দ্রষ্টা, যোদ্ধা এবং বদমাসরা রূঢ় বাস্তবের আঙিনায় এত বেশি বেশি করে ছড়িয়ে আছে যে এ ধরণের চরিত্র সৃষ্টির জন্য আলাদাভাবে কল্পনার কোনো দরকার পড়ে না। —এখানেই রয়ে গেছে মার্কেজের চিন্তাচর্চার মূল দিকটি যা অবধারিতভাবে তাঁকে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। স্বভাবতই ভিয়েতনাম এবং চিলির ওপর মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনামুখর হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে একটি আন্দোলনে অংশগ্রহণের সূত্রে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। উত্তরকালে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেলের ঘনিষ্ঠ হন তিনি এবং লাতিন আমেরিকার বামপন্থী আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠেন। আমেরিকার শত্রু ফিদেলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাকে আমেরিকার শাসকরা সুনজরে দেখেননি যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

গাবো অর্থাৎ গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর জন্ম মার্চ ৬, ১৯২৭ তারিখে কলাম্বিয়ার এক অখ্যাত উপকূলবর্তী শহর আরাকাটাকায়। পিতার নাম গ্যাব্রিয়েল এলিজিয়ো গার্সিয়া এবং মা ল্যুইজা সান্তিয়াগা মার্কেজ। পিতামাতা গাবো-কে দাদু-দিদিমা-র কাছে রেখে ওষুধের ব্যবসা করার জন্য বারানকিলায় চলে যান। দশ বছর বয়সে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে গাবো-র নতুন করে পরিচয় হয়। ১৯৪৭-এ বোগোটার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার সময় দুটো ছোট গল্প রচনা করে মার্কেজ। দাঙ্গার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে বারানকিলায় সাংবাদিকতার কাজে যুক্ত হন তিনি। এসময় তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পাতা ঝড়' লিখতে শুরু করেন। বছর পাঁচেক পর 'পাতা ঝড়' প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি প্যারিতে যান এবং বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। কলেজে পড়ার সময় পরিচয় হয়েছিল মার্সিডিস বারকা-র সঙ্গে। তাঁকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিয়ে করেন ১৯৫৮-তে। ১৯৫৯-এ ফিদেল কাস্ত্রোর আহ্বানে কিউবা যান। কিছুকাল কিউবায় থাকেন। এরপর যান মেক্সিকোয়। এসময় প্রকাশিত তাঁর 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না', 'একাকিত্বের একশ বছর' লিখতে সময় নেন আঠারো মাস। এই সময় তিনি নিজেকে সমস্ত কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই উপন্যাসটি লেখার কাজে ব্রতী হন। সম্ভাব্য আর্থিক প্রতিকূলতার কথা মাথায় রেখেই নিজের গাড়ি বিক্রি করে টাকাটা স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে সংসার চালাবার জন্য তাঁর স্ত্রী প্রচুর ধার-বাকি করেছেন। দেনার পরিমাণ ছিল বারো হাজার ডলার। ১৯৬৭-তে প্রকাশিত হয় 'একাকিত্বের একশ বছর'। বাণিজ্যিক সাফল্যের তুঙ্গসীমায় ওঠে এই উপন্যাসটি। ১৯৭২-এ এই উপন্যাসটির জন্য মার্কেজ রোমুলো গ্যালেগোজ পুরস্কার পান। উপন্যাসটিকে য়্যুনিয়াম কেনেডি সমগ্র মানবজাতির পাঠযোগ্য সাহিত্যের প্রথম উপহার হিসেবে অভিহিত করেন। এরপর ১৯৮২-তে উপন্যাসটির জন্য মার্কেজ নোবেল পুরস্কার পান। সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে এই উপন্যাসটি এ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে পাঁচ কোটি কপি।

মার্কেজের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ঃ দ্য অটাম অব দ্য পেট্রিয়ার্ক (১৯৭৫), ক্রনিক্‌ল্ অব আ ডেথ ফোরটোল্ড (১৯৮১), লভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা (১৯৮৫), দ্য জেনারেল ইন হিজ ল্যাবরিন্দ্ (১৯৮৯), অব লভ অ্যাণ্ড আদার ডেমনস (১৯৯৪), নিউজ অব কিডন্যাপিং (১৯৯৬), লিভিং দ্য টেল দ্য টেল (২০০২), মেময়র্স অব মাই মেলানকলি হোরস্ (২০০৪)। শেষের বইটি (উপন্যাস) প্রকাশিত হলে ইরানে বিতর্ক তৈরি হয় এবং প্রাথমিকভাবে পাঁচ হাজার কপি বই বিক্রি হওয়ার পর বইটি সেখানে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

১৯৯১-তে মার্কেজের লিমফ্যাটিক কান্সার ধরা পড়ে। লস এঞ্জেলস্-এর হাসপাতালে তাঁর কেমোথেরাপি হওয়ার পর তিনি অনেকখানি সুস্থ হন। ২০০৫-এ তিনি আর কিছুই লিখে উঠতে পারেননি। ২০১২-তে তিনি ডিমেনসিয়া-য় আক্রান্ত হন। ২০১৪-র এপ্রিলে তাঁকে মেক্সিকোর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর ফুসফুসে এবং য়্যুরিনারি ট্রাকে সংক্রমণ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মার্কেজ প্রয়াত হন গত ১৭ এপ্রিল, সাতাশি বছর বয়সে।

বিস্তর এবং ভিন্নমাত্রিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন মার্কেজ। প্রথম দশবছর মাতাপিতার সাহচর্য পাননি। পেয়েছেন দাদু-দিদিমাকে। দিদিমার গল্পবলার স্বপ্নবিধুর কৌশল তাঁকে স্বপ্ন দেখতে এবং গল্প লেখার প্রকরণ আত্মস্থ করতে শিখিয়েছিল। দাদুর জীবনকাহিনী তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে গল্পবুননের ভিত্তি রচনা করেছিল। কলেজের অসমান্য জীবন, সাংবাদিকতা, বেনিয়ম, ধুমপান সহ এক নৈরাজ্যিক জীবনযাপন ছিল তাঁর। আর এর ফলে গল্পকথনের ক্যানভাস নির্মাণে তাঁর কোনও অসুবিধাই আর হয়নি। স্বভাবতই তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি ঃ চেনা-জানা গল্পগুলোই তো আমি বলে থাকি, লাতিন আমেরিকাকে যেভাবে চিনেছি সেভাবেই নির্মাণ করি আমার চেনা-জানার অবয়ব। এটাই তো আমার দৃষ্টিভঙ্গীর ফলিত রূপ, ফলে তাতে রাজনীতির সাঙ্গকরণ না ঘটে পারে না। এর পাশাপাশি বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি ঔদার্য, ফিদেল কাস্ত্রোর সাহচর্য—তাঁকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দিক দিয়ে গণজীবনকে দেখতে, বুঝতে এবং চিনতে শিখিয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি মার্কিন আগ্রাসনের সমালোচনা করতে দ্বিধান্বিত হননি, দ্বিধান্বিত হননি মার্কিন সরকারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে কিউবার বামপন্থী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে। ফিদেল তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ মার্কেজ হলেন এমনই এক প্রতিভার অধিকারী যাঁর মধ্যে আছে শিশুসুলভ ঔদার্য আর আগামীদিনের একজন পরিপূর্ণ মানুষ।

ফিদেলের সঙ্গে মার্কেজের সম্পর্কের নৈকট্যকে অনেকেই ভালোভাবে নেননি। পেরুর নোবেল জয়ী লেখক মারিও ভার্গাস লোজা মার্কেজকে ফিদেল কাস্ত্রোর 'কার্টিজান রাইটার' বলে কুৎসা করেছিলেন। এর উত্তর দিতে গিয়ে ১৯৮২-তে ক্লডিয়া ড্রিফাস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কেজ জানিয়েছিলেন যে কাস্ত্রোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সাহিত্যচর্চার বিষয়েই, তাঁদের মধ্যেকার বন্ধুত্ব দু'জন বুদ্ধিচর্চাকারীর মত বিনিময়ের ভিত্তিতেই; কাস্ত্রো যে একজন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ এ তথ্য অনেকের জানা নেই—তাঁরা যখন একসঙ্গে মুখোমুখি হন তখন তাঁরা সাহিত্য-শিল্প বিষয়েই আলোচনা করে থাকেন।

কাস্ত্রোর সঙ্গে সজীব বন্ধুতার কারণে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনার ফলশ্রুতিতে মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ বহুবছর মার্কেজকে ভিসা মঞ্জুর করেনি। বিল ক্লিন্টন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

মার্কেজ আর নেই। মারিও ভার্গাস লোজার চোখে আজ জল টলটল করছে। তিনি কাঁদছেন। আজ তিনি অকপটে স্বীকার করছেন ঃ মার্কেজ বিশ্বের সাহিত্যকে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। আজ তিনি নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে লোজার হৃদয় অসহ্য যন্ত্রণায় ক্রমাগত রক্তাক্ত হচ্ছে।

মার্কেজ নেই। আছে তাঁর স্বপ্নের অফুরন্ত আকাশের নীল। আছে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখিরা, যারা লড়াইয়ের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে দেশে, দেশান্তরে। **- অশোক চট্টোপাধ্যায়**

হুগলী লোকসভা কেন্দ্রে ...

একের পাতার পর

তুলে পতাকায় তিন তারা চিহ্নে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। দুপুরে প্রচারকেরা এক চটকল শ্রমিকের বাড়িতে দুপুরের খাবার খান। নর্থ শ্যামনগর জুটমিলের শ্রমিক বস্তির এক অপরিসর ঘরে কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে ঠিক পাঁচটায় সজল অধিকরীকে নিয়ে শুরু হয় পদযাত্রা। আমরা যখন শ্রমিক মহল্লায় ঢুকছি, শ্রমিক পরিবার মহিলারা তখন উনুনে আঁচ দিয়েছেন, কাজ সেরে খাটিয়ায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন শ্রমিকেরা। উনুনের ধোঁয়া ঘেরা শ্রমিক মহল্লার সেই ঘিঞ্জি গলিতে সোৎসাহে হিন্দি প্রচারপত্র বিলি করছিলেন কমরেডরা। ডেকে ডেকে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রার্থীর পরিচয় করাচ্ছিলেন রাজেশ্বর। অবসন্নতা ঝেড়ে খাটিয়ায় উঠে বসে প্রার্থীকে প্রতিনমস্কার করছিলেন শ্রমিকরা। মালিক-অসাধু নেতা-সরকার-প্রশাসনের জোটের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলছিলেন উপস্থিত সবাই। শ্রমিক মহল্লা থেকে বেরিয়ে এসে জি টি রোড ও অন্যান্য রাস্তা ধরে মানকুণ্ডু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির মোড়ে এসে পদযাত্রা শেষ হয়। জেলা সদস্য বটকৃষ্ণ দাস, বিদ্যুৎ শিল্পের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী তাপসদা দীর্ঘ পদযাত্রায় হেঁটে অন্যান্যদের উৎসাহিত করেন। পরেরদিন ১৯ এপ্রিল বিকেলে ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে শুরু হয় পথ পরিক্রমা। সকালে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের কাজের জায়গাগুলোতে গাড়িতে করে প্রচার চালায়। বিকেলের কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, রাজ্য কমিটির সদস্য চৈতালী সেন, দেবব্রত ভক্ত, অপূর্ব ঘোষ। কোন্নগর থেকে আসা বড় সংখ্যক নির্মাণ শ্রমিকদের সঙ্গে পা মেলান এলাকার বর্ষীয়ান কমরেডরা। প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে চলা এই পথ পরিক্রমা ছুঁয়ে যায় দক্ষিণ নলডাঙ্গা স্টেশন রোড, বলাগড়, বালির মোড়, চকবাজার এলাকার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এলাকাগুলো। হুগলী ঘাটের দলীয় কার্যালয়ে এসে এই প্রচার কর্মসূচী শেষ হয়।

দাম বাঁধার লড়াই, কাজের পুরো মজুরি পাওয়ার লড়াই, বন্ধ কারখানা খোলার লড়াই, ক্ষেতমজুরদের দাবির লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই—এই সমস্ত কিছুর জন্য পাড়ি জমিয়েছে সি পি আই (এম এল), পাড়ি জমিয়েছে প্রার্থী-নেতা-কর্মীরা। **- ভিয়েত**

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল,
অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র,
অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল,
কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ১.৫০ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : deshabrati@gmail.com//cpimlwb@yahoo.com